بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বায়তুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৩১ জুলাই, ২০১৫ মোতাবেক ৩১ ওফা, ১৩৯৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

কুরআন পাঠের প্রয়োজনীয়তা এবং...

সম্প্রতি কেউ স্বল্প দৈর্ঘ্য একটি ভিডিও দেখিয়েছে, তাতে এক আফ্রিকান মৌলভী বয়স্কদের কুরআন পড়াচ্ছিল, আর সামান্য ভুলের কারণে বেত্রাঘাত করে তাদের অবস্থা শোচনীয় করে ফেলে। এখন যার ভাষা ভিন্ন আর বয়সও যদি সতের-আঠার বা এর বেশি হয়, তাহলে এমন মানুষ কীভাবে ক্বারীদের মত প্রতিটি অক্ষর সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে? ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হল, মানুষ কুরআন পাঠ করার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। এ কারণেই মুসলমানদের অনেকেই পবিত্র কুরআন পাঠ করতে জানে না। আমি বিশেষ করে অনারবদের কথা বলছি। অতএব, **যদি কুরআন পড়া শেখাতে হয়, তাহলে এমনভাবে পড়ানো উচিত, যার ফলে কুরআনের প্রতি গভীর আগ্রহ এবং ভালোবাসা সৃষ্টি হয়**।

সম্প্রতি এক জাপানী ভদ্র মহিলা সাক্ষাতের জন্য আসেন, যিনি এখানে বসবাস করেন। তিনি কিছুদিন পূর্বে বয়আত করেছেন। তিনি আমাকে জানিয়েছেন, তিন বছরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি পবিত্র কুরআন পড়া শেষ করেছেন, আর কিছুটা শোনানোরও আগ্রহ ব্যক্ত করেন। আমি বললাম, ঠিক আছে শোনান। তিনি হৃদয়ের এত গভীর থেকে আয়াতুল কুরসী পাঠ করেন যে, আশ্চর্য হতে হয়। তাই আসল বিষয় হল, কুরআনের প্রতি এমন ভালোবাসা থাকা চাই আর এতে অবগাহন করে তা পড়া উচিত। শুধু প্রদর্শন বা দেখানোর জন্য ক্বারীদের ন্যায় গলা থেকে ধ্বনি বা আওয়াজ নির্গত করাই যথেষ্ট নয়। আল্লাহ্ তা'লা 'তারতীল'-এর সাথে বা ধীরে ধীরে তিলাওয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন। যতটা সঠিক উচ্চারণ করা সম্ভব, সঠিক উচ্চারণের সাথে পড়া উচিত। আমরা যদি দাবি করি যে, আমরা আরবদের মত শব্দ উচ্চারণ করতে পারি, তাহলে এমনটি করা খুবই কঠিন। অনারবরা কোন কোন অক্ষরের উচ্চারণ সঠিকভাবে করতেই পারবে না। তবে, সে যদি আরবদের মাঝে লালিত-পালিত হয় তাহলে ভিন্ন কথা। জাপানি জাতিও কোন কোন অক্ষর সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে না। যেমন, এই যে ভদ্র মহিলা পড়েছেন, তার উচ্চারণে 'হে' এবং 'খে'-এর পার্থক্য ছিল না বা 'খে' এমনভাবে উচ্চারণ করছিলেন, যাতে স্পষ্টভাবে 'হে'-ই শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু একজন জাপানি মহিলার কাছ থেকে তিলাওয়াত শুনে আমার মাঝে এই উপলব্ধি সৃষ্টি হয়েছে যে, সব জাপানি

না হলেও অনেক জাপানি এই ভদ্র মহিলার মতই হবেন, যাদের জন্য অনেক অক্ষর উচ্চারণ করা কষ্টসাধ্য। যাহোক, আসল বিষয় হল, আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র বাণীর প্রতি ভালোবাসা। যথাসাধ্য সঠিকভাবে তা উচ্চারণের চেষ্টা করা উচিত। ক্বারী হওয়া যেন উদ্দেশ্য না হয়, আর লোক দেখানোর জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ যেন উদ্দেশ্য না হয়। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর হযরত বেলাল (রা.)-এর 'আশহাদু'-এর পরিবর্তে 'আস্হাদু' বলার উপর যে স্নেহদৃষ্টি ছিল, কোন ক্বারী বা কোন আরব তার মোকাবিলা করতে পারবে না। **(খুতবাতে মাহমুদ, ১৫তম খণ্ড, পৃঃ ৪৭০)**

অতএব, অমুসলমানদের মধ্য থেকেও মানুষ জামা'তভুক্ত হচ্ছে এবং ইসলাম গ্রহণ করছে। যেমনটি আমি বলেছি, মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী কুরআন পড়তে জানে না। আফ্রিকায় আমাদের মুবাল্লিগরা অনেক ক্ষেত্রে এমন বিষয়ের সম্মুখীন হন, যেখানে তাদেরকে নতুনভাবে কুরআন পড়াতে হয়, বরং শুরু থেকে তাদেরকে কায়দা পড়াতে হয়। তাদেরকেও কুরআন পড়াতে হবে। তাই, কুরআনের শিক্ষকদের এমনভাবে কুরআন পড়ানো উচিত, যেন কুরআনের প্রতি গভীর আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তা'লা সেই পাকিস্তানি ভদ্র মহিলাকেও প্রতিদান দিন, যিনি এই জাপানি মহিলাকে শুধু কুরআনই পড়ান নি বরং এমন মনে হয়, যেন কুরআনের প্রতি তার মাঝে ভালোবাসাও সৃষ্টি করেছেন।

অতএব, কেবল ক্বারীর ন্যায় ক্বিরাআত করাই আসল বিষয় নয়। আর এমনটি ভাবা উচিত নয় যে, এভাবে শব্দ উচ্চারণ করতে না পারলে কুরআন পড়াই ছেড়ে দিবেন। কুরআন পড়া আবশ্যক, আর এক্ষেত্রে মানোন্নয়নের চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু আমরা কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করতে পারি না বা এগুলো কষ্টসাধ্য, শুধুমাত্র এই ধারণার বশবর্তী হয়ে কুরআন পাঠ পরিত্যাগ করা উচিত নয়। বরং নিয়মিত কুরআন পাঠের প্রতি প্রত্যেক আহমদীর দৃষ্টি থাকা চাই। হ্যাঁ, এই চেষ্টা অবশ্যই থাকা উচিত, যেমনটি আমি বলেছি, সহজভাবে মূল শব্দের যতটা নিকটতর উচ্চারণ করা যায়, তা করা উচিত, আর এক্ষেত্রে ক্রমাগতভাবে উন্নতি করার চেষ্টা করা উচিত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন, আমাদের প্রতিটি অক্ষর ক্বারীর মতই উচ্চারণ করতে হবে, এমন চেষ্টা ঠিক নয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'লা সেই শক্তি আমাদের দেন নি। অর্থাৎ যারা অনারব, তাদের কথা বলা হচ্ছে। তিনি বলেন, আমার মরহুমা স্ত্রী উম্মে তাহের বলতেন, তার পিতার কুরআন পাঠ করা এবং পড়ানোর সুগভীর আগ্রহ ছিল। তিনি তার ছেলেদের পড়ানোর জন্য শিক্ষক রেখেছিলেন, আর মেয়েকে পড়ানোর দায়িত্বও তার উপরই ন্যস্ত করেছিলেন। উম্মে তাহের বলেন, সেই শিক্ষক অনেক বেশি মারতেন। আমাদের দু'আঙ্গুলের মাঝে ছোট কঞ্চি রেখে (অর্থাৎ পেন্সিল আকারের গাছের ছোট ডাল রেখে, আবার কোন কোন শিক্ষক পেন্সিলও রাখেন) আঙ্গুলের উপর চাপ দিতেন, মারতেন, প্রহার করতেন। কারণ হল, আমরা কেন সঠিকভাবে উচ্চারণ করি না। আমাদের পাঞ্জাবীদের উচ্চারণ এমনই, অর্থাৎ আরবী শব্দ আমরা আরবদের মত করে উচ্চারণ করতে পারি না। **(আল্ ফযল, ১১ অক্টোবর, ১৯৬১, পৃঃ ২-৩, ৫০/১৫ তম খণ্ড, ২৩৫তম সংখ্যা)**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সেই আরবের ঘটনার উল্লেখ করেন, যার কথা আমি গত খুতবায় বলেছিলাম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সেই আরব সাক্ষাৎ করতে আসে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন দু'তিন বার 'দোয়াদ' শব্দ বলেন তখন সেই ব্যক্তি বলে, আপনি কীভাবে মসীহ্ মওউদ হতে পারেন? কেননা, আপনি 'দোয়াদ' শব্দও সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে জানেন না। সেই আরব এমনটি বলে খুবই অন্যায় কাজ করেছে। প্রত্যেক দেশের উচ্চারণ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। আরবরা নিজেরাই বলে, আমরা 'নাতেক্বীন বিদ্দাদ' অর্থাৎ 'দোয়াদ' শুধু আমরাই উচ্চারণ করতে পারি, ভারতীয়রা তা পারে না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, ভারতীয় মানুষ এটিকে হয়ত 'দোয়াদ' বলে থাকে বা 'যাদ'। কিন্তু এর উচ্চারণ ভিন্ন। আরবরা যেহেতু নিজেরাই বলে, আমরা 'নাতেক্বীন বিদ্দাদ' এবং আমরা ছাড়া অন্য কেউ এটি সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে না, তাই আপত্তির কী আছে বা এক্ষেত্রে আপত্তির যৌক্তিকতা কোথায়? **(আল্ ফযল, ১১ অক্টোবর, ১৯৬১, পৃ. ৩, ৫০/১৫তম খণ্ড, ২৩৫তম সংখ্যা)**

অতএব, আরব আহমদীদেরও এটি দৃষ্টিতে রাখা উচিত। সচরাচর অধিকাংশ (আরব) একথা বুঝে, কিন্তু কেউ কেউ স্বভাবজভাবে অহঙ্কারীও হয়ে থাকে। এক পাকিস্তানি মহিলার একজন আরবের সাথে বিয়ে হয়েছে। তিনিও নিজের মত করে গলা থেকে শব্দ উচ্চারণ করে মনে করেন, আমি সঠিক উচ্চারণ করেছি, অথচ সেই উচ্চারণও ষোলআনা সঠিক নয়। যদি এ কথা তার নিজ সত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে কোন অসুবিধা ছিল না, আর এখানে আমার বলারও প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু আমি জানতে পেরেছি, সেই মহিলা কোন কোন অধিবেশনে হাসি-ঠাট্টার ছলে বলে থাকে, পাকিস্তানিরা কোন কোন অক্ষর উচ্চারণ করতে পারে না, কুরআন পড়তে জানে না, আরবী অক্ষর সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে না, আর আরবরাও তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে। আরবদের সবাই যে এমন হাসি-ঠাট্টা করে বা তিরস্কার করে তা কিন্তু আমি মনে করি না। হতে পারে, যে আরবের সাথে তার বিয়ে হয়েছে তারা হয়তো এমনটি করে। ইসলাম বলে, সব জাতির মন জয় করে তাদেরকে আল্লাহ্‌র কালাম বা **বাণীর সাথে শুধু পরিচিত করালেই চলবে না**, বরং তা পাঠের জন্য তাদের হৃদয়ে সেই কালামের প্রতি ভালোবাসাও সৃষ্টি করতে হবে। সবার উচ্চারণ ভিন্ন ভিন্ন, সবাই কুরআনের প্রতি ভালোবাসার কারণে সর্বোত্তমভাবে তা পাঠের চেষ্টা করে, আর তা-ই করা উচিত। সঠিক এবং বিশুদ্ধ উচ্চারণের ব্যাপারে যত্নবান অবশ্যই হওয়া উচিত। আর যারা সঠিকভাবে কুরআন পড়তে জানে এবং এ বিষয়ে নবাগত মুসলমানদের সাহায্য করতে পারে, তাদের তা করা উচিত। কিন্তু হাসি-ঠাট্টা করার অনুমতি দেয়া যেতে পারে না।

অতএব, যারা সঠিক উচ্চারণ জানে, তাদের এই বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখা উচিত। পৃথিবীতে বিভিন্ন মানুষ বা জাতির বসতি রয়েছে। প্রত্যেক হরফ এবং প্রত্যেক অক্ষর সবাই সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে না।

এখন আমি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর প্রেক্ষাপটে আরো কিছু ঘটনা উপস্থাপন করছি। **মুসলমানদের অবস্থা যে কতটা শোচনীয় সে সম্পর্কীত** একটি উপমা দিতে গিয়ে তিনি (রা.) এক জায়গায় বলেন, একটি প্রসিদ্ধ উপমা আছে যে, এক ভীরু ছিল। তার মনে কোনভাবে এই ভ্রান্ত ধারণা জন্মায় যে, সে খুব সাহসী। একদিন সে যারা উলকি আঁকে (অর্থাৎ ট্যাটু করে বা উলকি-শিল্পী) তাদের কাছে যায়। পুরোনো যুগে রীতি ছিল, পালোয়ান এবং বীরপুরুষরা নিজেদের চরিত্র এবং অভ্যাস অনুসারে তাদের বাহুতে উলকি আঁকাত। (এখানে ইউরোপেও এর অনেক প্রচলন রয়েছে) যাহোক, এই ব্যক্তিও, যারা উলকি আঁকে তাদের কাছে যায়। যে ব্যক্তি উলকি আঁকবে, সে জিজ্ঞেস করে, কিসের উলকি আঁকাতে চাও? সে বলে, আমি সিংহের উলকি আঁকাতে চাই। যখন সে সিংহের উলকি আঁকতে আরম্ভ করে, আর তা আঁকার জন্য শরীরে সুঁই ফোটায়, সুঁই ঢুকানোর ফলে ব্যথাতো পাওয়ারই কথা, আসলে সেই ব্যক্তির কোন সাহসই ছিল না (অযথাই সাহসী সাজার ভান করত), তখন সে বলে, এটি কি করছ? উলকি-শিল্পী বলে, আমি সিংহের উলকি আঁকছি। সে জিজ্ঞেস করে, সিংহের কোন অংশ আঁকছ? সে বলে, আমি লেজ আঁকছি। সেই ভীরু বলে, সিংহের লেজ যদি কেটে যায় তবে সেটি কি সিংহ থাকে না? সে বলে, সিংহ থাকবে না কেন? তখন সে বলে, আচ্ছা লেজ বাদ দিয়ে অন্য কাজ কর। এরপর পুনরায় সুঁই ঢুকালে সে বলে, এখন কী করছ? উলকি-শিল্পী বলে, এখন ডান বাহু আঁকছি। সেই ব্যক্তি বলে, লড়াই বা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যদি সিংহের ডান বাহু কাটা পড়ে তাহলে সেটি কি আর সিংহ থাকে না? সে বলে থাকবে না কেন। তখন সে বলে, তাহলে এ অংশও ছেড়ে দিয়ে পরের কাজ কর।

এভাবে বাম বাহুর উলকি আঁকতে গেলে সেটিও বাদ দেয় আর জিজ্ঞেস করে, এটি ছাড়া কি সিংহ থাকে না? এরপর পায়ের উলকি আঁকতে গেলেও সে একই কথা বলে। অবশেষে সেই উলকি-শিল্পী হাত গুটিয়ে বসে পড়ে। যে ট্যাটু বা উলকি আঁকাতে গিয়েছিল এবং নিজেকে খুব সাহসী মনে করত সে বলে, কাজ করছ না কেন? তখন উলকি-শিল্পী বলে, এখন তো আর কিছুই করার নেই, আমি কী করব? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, ইসলামের সাথেও আজকাল একই ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশেষ করে মুসলমান আলেম-উলামা এবং নেতাদের কাজই এটি। তারা অনেক বড় বড় বুলি আওড়ালেও কাজের বেলায় ঠনঠন। তারা যেসব বিষয়ে অন্যদের উপদেশ দেয়, ইসলামের শিক্ষার সাথে তার দূরতম কোন সম্পর্কও নেই। নিজেদের স্বার্থের জন্য তারা বলে এটিও ছেড়ে দাও, সেটিও বাদ দাও, আর এভাবে একের পর এক শিক্ষাকে তারা জলাঞ্জলি দিতে থাকে।

এ সম্পর্কে আরো একটি উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, আমাদের নানাজান হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব বলতেন, শৈশবে আমি খুবই চঞ্চল ছিলাম। তিনি মীর দার্দ-এর দৌহিত্রও ছিলেন এবং দিল্লী নিবাসী ছিলেন। সেখানে অনেক আমও হয়। তিনি বলতেন, আমের মৌসুমে সকালে আমরা পিতা-মাতা এবং ভাই-বোন সবাই মিলে আম খেতে বসতাম। যে আমটি মিষ্টি হত, আমি সেটিকে টক বলে একপাশে রেখে দিতাম, আর বাকি আম সবার সাথে বসে বসে খেতাম। আম

চোষার জন্য প্রথমে একবার চেক করতে হয়, আর তিনি চেক করে বলতেন, এটি টক অথচ সেটি আসলে মিষ্টি হত। যখন সবার আম খাওয়া শেষ হয়ে যেত, তখন আমি বলতাম, আমার পেট ভরে নি, তাই এখন আমি টক আমগুলোই খেয়ে নিচ্ছি, আর এভাবে সব আম খেয়ে ফেলতাম। একদিন আমার বড় ভাই, যিনি পরে মীর দার্‌দ-এর গদ্দিনশীন বা স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন, তিনি বলেন, আজ আমারও পেট ভরে নি, আজকে আমিও টক আম খাব। তিনি বলেন, আমি তাকে অনেক বুঝানোর চেষ্টা করলেও তিনি বিরত হন নি। শেষে আম খেতে আরম্ভ করেন এবং বলেন, আম তো খুবই মিষ্টি, তুমি এমনিতেই টক টক বলছিলে। যেভাবে আম চোষার সময় তিনি মিষ্টি আম পৃথক করে রেখে দিতেন আর বাকি আম অন্যদের সাথে একত্রে বসে খেতেন, পরে টক বলে রেখে দেওয়া আমগুলোও খেয়ে ফেলতেন। মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, বর্তমান সময়ের মুসলমানদের অবস্থাও এমনই।

যেসব লোক বলে, ইসলামী শরীয়ত এভাবে বলবৎ করা উচিত। তাদের অবস্থা যদি এমন হয়, তাহলে সেসব লোকের অবস্থা কী হবে, যারা ইসলাম সম্বন্ধে জানেই না। ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করার কথা যারা বলে তারা এমনটিই করে। প্রতারণামূলক ভাবে নিজেদের জন্য বিভিন্ন জিনিস পৃথক করে রেখে দেয়। (এখানে আমের ক্ষেত্রে যিনি এমনটি করেছেন) তার তো শৈশবকাল ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে তো জেনে-শুনে ভুল কাজ করা হয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, যারা ইসলাম সম্পর্কে জানেই না তারা তো হাড়-মাংস কিছুই আর বাকী রাখবে না। **(আল্ ফযল, ১১ অক্টোবর, ১৯৬১, পৃ. ৩, ১৫/৫০তম খণ্ড, ২৩৫তম সংখ্যা)**

ইসলামের অনেক বড় একটি হৃদয় বিদারক ঘটনা

সবকিছুই এভাবে খেয়ে ফেলবে, যদিও তা অবৈধ হোক না কেন। কাজেই বর্তমান সময়ের আলেমরাও লুটপাটের জন্য এভাবে বৈধতা সন্ধান করে, যা আমরা চতুর্দিকে দেখতে পাচ্ছি, আর এটিই হল, বর্তমান যুগে ইসলামের করুণ দশা। এসব আলেমের কারণে অন্যরাও ইসলামের নামে লুটপাট করছে। এসব উলামার কারণেই বিভিন্ন সংগঠন মাথাচাড়া দিয়েছে, আর এর ফলে তারা যুলুম-অত্যাচারের বাজার গরম করে রেখেছে। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের প্রতি প্রসন্ন হোন। এরপর আমাদের কীভাবে আত্মসংশোধনের পন্থায় নিজেদের ঈমান বৃদ্ধি করা উচিত, আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে কীভাবে সম্পর্ক নিবিড় করা যায়, তা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) জামা'তকে নসীহত করে বলেন, "যদি আপনারা নিজেদের মাঝে তাকওয়া এবং পবিত্রতা সৃষ্টি করেন, দোয়া এবং যিকরে ইলাহীতে অভ্যস্ত হন, তাহাজ্জুদ এবং দরূদ শরীফ যথারীতি পড়েন, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই আপনাদেরও সত্য স্বপ্ন ও দিব্য দর্শন থেকে অংশ দান করবেন, এবং স্বীয় ইলহাম ও বাণী দ্বারা সম্মানিত করবেন। আর সত্যিকার অর্থে জীবন্ত নিদর্শন সেটিই যা মানুষের নিজ সত্তায় প্রকাশ পায়। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর নিদর্শনও নিঃসন্দেহে অনেক বড়। হযরত মূসা (আ.)-এর নিদর্শনও অনেক বড়। হযরত ঈসা (আ.)-এর নিদর্শনও অনেক বড়,... কিন্তু মানুষের নিজ সত্তার যতটুকু সম্পর্ক

আছে, তার জন্য সেই নিদর্শনই মহান হয়ে থাকে, যা মানুষ নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করে"। [আজও মানুষ এই প্রশ্নই করে। যদি নিদর্শন দেখতে হয়, তাহলে আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করাও আবশ্যক।

ঈমান বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত নিদর্শনের উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি (রা.) হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ শহীদ (রা.)-এর কথা উল্লেখ করে বলেন,] "সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ শহীদ সাহেবকে দেখ! তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর কিছুদিন কাদিয়ানে অবস্থান করে কাবুল ফিরে যান। তখন সেখানকার গভর্ণর তাকে ডেকে বলে, তওবা কর। তিনি বলেন, আমি কীভাবে তওবা করতে পারি? যখন কাদিয়ান থেকে যাত্রা করি, তখনই আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমাকে হাতকড়া পরানো হয়েছে। অতএব, খোদা তা'লা যেখানে আমাকে বলেছিলেন, এ পথে তোমাকে হাতকড়া পরতে হবে, এখন আমি কীভাবে সেই হাতকড়া খোলানোর চেষ্টা করতে পারি? এই হাতকড়া আমার হাতেই থাকা উচিত, যেন আমার প্রভুর কথা পূর্ণতা লাভ করে। দেখ! এই আস্থা এবং এই দৃঢ় বিশ্বাস তিনি এজন্য অর্জন করেছিলেন কারণ তিনি নিজেই একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তির জ্ঞান যত স্বল্পই হোক না কেন, যদি সে কোন স্বপ্ন দেখে আর ভীরুতার কারণে যদি সে তা গোপন করে, তাহলে ভিন্ন কথা। নতুবা নিজের মিথ্যা স্বপ্নের উপরও এর চেয়ে তার বেশি বিশ্বাস বা আস্থা থাকে"। **(আল্ ফযল, ২২ জুলাই, ১৯৫৬, পৃ. ৫, ৪৫/১০তম খণ্ড, ১৬৯তম সংখ্যা)**

অতএব, মানুষের ঈমান যদি দৃঢ় হয় আর আল্লাহ্‌র সাথে যদি সম্পর্ক থাকে, তাহলে এই জগৎ-পূজারী লোকদের মানুষ ভয় করে না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরো একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, হযরত সুফী আহমদ জান সাহেব লুধিয়ানভী অনেক বড় বুযূর্গ ছিলেন। তিনি নিজ যুগের পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। একবার জম্মুর মহারাজা তাকে আমন্ত্রণ জানান যে, আপনি জম্মু এসে আমার জন্য দোয়া করুন। কিন্তু তিনি যেতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, যদি দোয়া করাতে চান, তাহলে এখানে আমার কাছে আসুন। **(আল্ ফযল, ২৭-৩০ মার্চ, ১৯২৮, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ৯, ৭৬-৭৭তম সংখ্যা)**

আমি কেন আপনার কাছে যাব? অতএব আল্লাহ্‌র সাথে যদি সম্পর্ক থাকে, তাহলে মানুষ যত বড়ই হোক না কেন, তাকে সে ভয় করে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির পূর্বে তাঁর প্রতি মানুষের কেমন ভক্তি এবং শ্রদ্ধা ছিল, আর তাঁর দাবির পর অবস্থা কীভাবে পাল্টে গেছে, এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, দেখ! বারাহীনে আহমদীয়ার খ্যাতিকে দৃষ্টিপটে রেখে আমরা বলতে পারি, লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করত। এ বিষয়ে এক জনের তো সাক্ষ্যও রয়েছে, যিনি তাঁর (আ.) দাবির পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন (অর্থাৎ সূফী আহমদ জান সাহেব, যার কথা আমি পূর্বেই বলেছি, যিনি বলেছিলেন দোয়া করাতে হলে এখানে আসুন)। দাবির পূর্বেই লুধিয়ানার সূফী আহমদ জান সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, (ইতঃপূর্বেও আমরা বেশ কয়েকবার শুনেছি, তার একটি প্রসিদ্ধ পঙক্তি রয়েছে,

سب مریضوں کی ہے تمہیں پہ نظر تم مسیحا بنو خدا کے لئے

(উচ্চারণ: "সাব মরিযোঁ কি হ্যায় তুমহী পে নযর তুম মসীহা বানো খোদা কে লিয়ে" অর্থাৎ, যুগের সকল রোগাক্রান্ত মানুষের দৃষ্টি তোমার উপর নিবদ্ধ। তুমি খোদার খাতিরে চিকিৎসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হও)

এটি ছিল একজন ওলী-আল্লাহ্‌র দূরদৃষ্টি। [সূফী আহমদ জান সাহেব ওলী-আল্লাহ্ ছিলেন। তার দূরদৃষ্টি ছিল, তিনি দেখেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-ই প্রতিশ্রুত মসীহ্। তিনি দাবি করুন বা না করুন] কিন্তু আমরা বলতে পারি, যারা এতটা দূরদৃষ্টি রাখে না, তারাও জানত, ইসলামের মুক্তি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পৃক্ত। সেই অস্ত্র যখন তাঁকে দেয়া হয় (অর্থাৎ সেই অস্ত্র যা দিয়ে ইসলামকে জয় করার কথা), যার মাধ্যমে শত্রু পদদলিত হওয়া সম্ভব ছিল, সেই জীবনসুধা দেয়া হয়, যার সাথে মুসলমানদের জীবন সম্পৃক্ত ছিল, তখন বড় বড় নিষ্ঠাবান মানুষ তাঁকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করে আর বলে, যাকে আমরা সোনা মনে করতাম, আক্ষেপ! তা তো পিতল প্রমাণিত হল। এমন লক্ষ লক্ষ মানুষ রাতারাতি কুধারণা পোষণ করতে আরম্ভ করে, এমনকি তিনি (আ.) যখন বয়আতের কথা ঘোষণা করেন, তখন প্রথম দিন কেবলমাত্র ৪০জন মানুষ তাঁর হাতে বয়আত করেন। এক সময় লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর প্রতি আন্তরিকতা রাখত। আর [হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,] বড় বড় প্রবীণ আলেমরা বলত, এই ব্যক্তিই ইসলামের সেবা করতে পারেন, আর স্বয়ং তারাই মানুষকে তাঁর কাছে পাঠাত। এমনকি মৌলভী সানাউল্লাহ্ সাহেব লিখেছেন, বারাহীনে আহমদীয়া ছাপার পর আমি মির্যা সাহেবের সাথে সাক্ষাতের জন্য পায়ে হেঁটে কাদিয়ান যাই। মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী, যিনি পরে বিরোধিতায় সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছেন, তিনি লিখেছেন, তেরশ' বছরে কেউ ইসলামের ততটা সেবা করে নি, যতটা এ ব্যক্তি করেছে। **(আল্ ফযল, ১৫ মার্চ, ১৯৩৪, পৃ. ৬, ২১তম খণ্ড, ১১০তম সংখ্যা)**

বর্তমান সময়েও বিভিন্ন নামধারী ইসলামিক টিভি চ্যানেল এ প্রেক্ষাপটে অনেক কথা বলে যে, মির্যা সাহেব তখন খিদমত করেছেন যখন প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পরে নাকি তিনি বিকৃতির শিকার হন, নাউযুবিল্লাহ্। আসলে, এরা এমনই মানুষ, যাদের হৃদয় অন্ধ। যাকে আল্লাহ্ তা'লা স্বর্ণ বানিয়েছেন, তাঁকে এরা পিতল মনে করে। আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারিক সাক্ষ্যের প্রতি না তাকিয়ে তারা নিজেদের প্রবৃত্তির অমানিশায় নিমজ্জিত, আর স্বল্প-জ্ঞানী মুসলমানদেরকেও এরা বিভ্রান্ত করছে। আল্লাহ্ তা'লা এদের কাণ্ডজ্ঞান দিন।

লুধিয়ানার দারুল বয়আতের গুরুত্ব

১৯৩১ সনের শূরায় একবার **লুধিয়ানার দারুল বয়আতের** উল্লেখ করা হয়। তখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) শূরার প্রতিনিধিদের বলেন, "আমার মতে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়

(অর্থাৎ, লুধিয়ানার দারুল বয়আত বা যেখানে বয়আত নেওয়া হয়েছে)। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিশেষভাবে এর উল্লেখ করেছেন এবং লুধিয়ানাকে 'বাবে লুদ্দ্' আখ্যা দিয়েছেন, যেখানে দাজ্জালকে বধ করার ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, (সে স্থান, যেখানে শত্রুর অবসান হবে, দাজ্জাল ধ্বংস হবে)। এটি এমন স্থান, যেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কাদিয়ান থেকে বয়আত নেওয়ার উদ্দেশ্যে গিয়েছেন। (এ স্থান সম্পর্কে) জামা'তের মধ্যে বিশেষ সচেতনতা থাকা চাই।

তাঁর (আ.) কাছে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) যখন বয়আত নেওয়ার অনুরোধ করেন, তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এখানে বয়আত নেয়া হবে না (অর্থাৎ কাদিয়ানে বয়আত নেয়া হবে না)। পরবর্তীতে তিনি (আ.) লুধিয়ানায় বয়আত নেন। সেখানকার মরহুম পীর আহমদ জান, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন। তবে, তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (আ.) দাবির পূর্বেই তাঁর প্রতি ঈমান আনার তৌফিক দিয়েছেন। (যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে) তিনি তার মৃত্যুর সময় পুরো পরিবারকে জড়ো করেন এবং বলেন, হযরত মির্যা সাহেব প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার দাবি করবেন, তখন তোমরা সবাই ঈমান এনো। যার ফলে এই পুরো পরিবার বয়আত করে। পীর মঞ্জুর মোহাম্মদ সাহেব এবং পীর ইফতেখার আহমদ সাহেব তার সন্তান। খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর স্ত্রী ছিলেন তার দুহিতা। [হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,] আমার ইচ্ছা হল, বিশেষভাবে এই স্থানের প্ল্যান করা, আর বয়আত নেওয়ার স্থানটিকে একটা পৃথক স্থান নির্বাচন করে তা চিহ্নিত করা উচিত। আর সেখানে এ উপলক্ষে জলসা করা উচিত। ৪০ জন মানুষের কাছ থেকে এখানেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বয়আত নিয়েছিলেন তাদের সবার নাম এ স্থানে লিখে দেওয়া হোক"। **(রিপোর্ট মজলিসে মুশাভেরাত, ১৯৩১, পৃ. ১০৬-১০৭)**

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় লুধিয়ানার এ ঘরটি এখন জামা'তের কাছে আছে। জামা'ত কতটা এর উপর আমল করেছে, কি হয়েছে, এখন আমার কাছে এ সংক্রান্ত তথ্য নেই। যাহোক, পরে জানা যাবে। এ জায়গাকে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রূপ দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর গুরুত্ব

এরপর লুধিয়ানা এবং মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন, মহানবী (সা.) স্বপ্নে দেখেছিলেন, তাঁর সামনে জান্নাতের একগুচ্ছ আঙ্গুর আনা হয়েছে, এবং বলা হচ্ছে, এটি আবু জাহলের জন্য। এর ব্যাখ্যা হল, তার পুত্র ইকরামা জান্নাত লাভ করবে আর বাস্তবেও তদ্রুপই হয়েছে।

এরপর তিনি (রা.) পুরো ঘটনা বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ তা'লা আবু জাহলের পুত্রকে এমনই পুণ্যবান করেছেন যে, তিনি ধর্মের জন্য ঈর্ষণীয় ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এক যুদ্ধের সময় মুসলমানরা ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন ছিল। খ্রিষ্টান তিরন্দাজরা চিহ্নিত করে করে মুসলমানদের চোখে তীর

নিক্ষেপ করছিল। সাহাবীগণ (রা.) একের পর এক শাহাদাত বরণ করছিলেন। ইকরামা (রা.) বলেন, আমি এটি সহ্য করতে পারছিলাম না। (ইনি আবু জাহলের পুত্র ছিলেন) এবং নিজে সেনাবাহিনীর সেনাপতিকে বলেন, আপনি আমাকে এদের উপর আক্রমণ করার অনুমতি দিন। এরপর তিনি ষাটজন বীর যোদ্ধা সাথে নিয়ে শত্রু সারির কেন্দ্রে গিয়ে আঘাত হানেন এবং ঝাঁপিয়ে পড়েন, আর এরূপ জোরালো আক্রমণ করেন যে, প্রাণ রক্ষার জন্য তাদের কমাণ্ডারকে পালাতে হয়। এর ফলে শত্রু সৈন্য দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এই বীর যোদ্ধা এত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন যে, মুসলমান সেনাবাহিনী যখন সেখানে (অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে) পৌঁছে, তাদের সবাই তখন হয় শহীদ বা গুরুতর আহত ছিলেন।

হযরত ইকরামা (রা.)ও গুরুতর আহত ছিলেন। একজন অফিসার এক গ্লাস পানি নিয়ে আহতদের কাছে আসেন। তিনি প্রথমে ইকরামা (রা.)-কে পানি দিতে চান, কিন্তু তিনি দেখেন, হযরত সুহায়ল বিন আমর (রা.) পানির দিকে তাকাচ্ছেন। তখন তিনি তাকে বলেন, প্রথমে সুহায়লকে পানি পান করাও, এরপর আমি পান করব। আমার ভাই পিপাসার্ত অবস্থায় আমার পাশে পড়ে থাকবে আর আমি পান করব তা আমার সহ্য হবে না। তিনি যখন সুহায়লের কাছে পানি নিয়ে যান, তখন তার পাশে হারেস বিন হিশামও আহত হয়ে পড়ে ছিলেন। তিনি বলেন, প্রথমে হারেসকে পানি পান করাও। হারেস (রা.)-এর কাছে পানি নিয়ে যাওয়ার পূর্বেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এরপর তিনি সুহায়ল (রা.)-এর কাছে ফিরে এসে দেখেন তিনিও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। এরপর তিনি ইকরামা (রা.)-এর কাছে এসে দেখেন তার প্রাণবায়ুও দেহ থেকে বেরিয়ে গেছে। অথচ ইকরামা (রা.) আবু জাহলের পুত্র ছিলেন।

অতএব, কোন ব্যক্তি যদি দুষ্কৃতকারী, ধর্মহীন এবং মিথ্যাবাদী হয় তাহলে কে বলতে পারে যে, তার পুত্রও অবশ্যই তার মতই হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার বাণীতে এমন সাক্ষ্য থাকে যা এর সত্যতাকে দিবালোকের মত সুস্পষ্ট করে। আর যাতে সাক্ষ্য থাকে না, তা মানার যোগ্যই নয়। আসল কথা হল, যেসব ভবিষ্যদ্বাণী আল্লাহ্ তা'লার, তা কীভাবে পূর্ণতা লাভ করে। অথচ মহানবী (সা.) যখন সেই স্বপ্ন বা রুইয়্যা দেখেছিলেন, তখন তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন যে, আবু জাহল জান্নাতে যাবে আর আমি তাকে আঙ্গুরের থোকা দিব এটি কী করে সম্ভব? প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ ছিল, তার পুত্র ঈমান আনবে এবং ইসলামের জন্য অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রেও (অর্থাৎ মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতেও) অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণীর মত অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে। তিনি এমন সময় এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন, যখন কাদিয়ানের মানুষও তাঁকে চিনতো না। কাদিয়ানের অনেক প্রবীণ মানুষও বলেছেন, আমরা তাঁকে চিনতামও না। আমরা মনে করতাম, গোলাম মুর্তজা সাহেবের কেবল একটিই সন্তান, যার নাম মির্যা গোলাম কাদের। এমন এক ব্যক্তি যিনি অচেনা-

অপরিচিত, যাকে তাঁর গ্রামের মানুষও চেনে না, তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সন্তান দেবেন, সে জীবিত থাকবে, আর তাঁর পুত্রদের মাঝে একজন পুত্র এমনও হবে, যে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করবে, আর তাঁর মাধ্যমে তাঁর তবলীগ এবং প্রচার পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে যাবে। কে আছে, যে নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে বানিয়ে এমন কথা বলতে পারে?

এরপর তিনি (রা.) বলেন, সেই পুত্র তিনকে চার করবে। এর একটি অর্থ হল, সে এই ভবিষ্যদ্বাণীর চতুর্থ বছরে জন্মগ্রহণ করবে। তিনি (আ.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন ১৮৮৬ সনে এবং [হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,] আমার জন্ম হয়েছে ১২ জানুয়ারি, ১৮৮৯ সনে। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ১৮৮৯ সনের ২৩ মার্চ লুধিয়ানায় প্রথমবার বয়আত নেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আমাদের জামা'তে এবং বাইরেও অনেক আলোচনা হয়। আর সচরাচর প্রশ্ন করা হত, সেই ছেলে কে? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, ভবিষ্যদ্বাণীতে সেই ছেলের নাম মাহমুদও বলা হয়েছে। তাই শুভ কামনায় তিনি (আ.) আমার নাম মাহমুদও রেখেছেন। আর তাঁর নাম যেহেতু বশীরে সানীও (দ্বিতীয় বশীর) ছিল, তাই আমার পুরো নাম বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ রেখেছেন।

সন্তান জন্মগ্রহণ এবং জীবিত থাকার যতটুকু সম্পর্ক ছিল, তাতে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে, আর এই ছেলের নাম মাহমুদ রাখার সৌভাগ্যও তাঁর (আ.) হয়েছে। কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণী কোন্ পুত্রের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে, পৃথিবীবাসী তা জানার অপেক্ষায় ছিল। অতএব, আজকে এটি জানানোর উদ্দেশ্যেই আমি লুধিয়ানায় এসেছি। (তিনি লুধিয়ানায় গিয়েছিলেন) তিনি (রা.) বলেন, বিভিন্ন দিক থেকে লুধিয়ানার সাথে আহমদীয়া জামা'তের সম্পর্ক রয়েছে। জামা'তের ইতিহাসের ক্ষেত্রে লুধিয়ানার গুরুত্বেরও বেশ কিছু দিক রয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রথম বয়আত নিয়েছেন এই শহরে। (প্রথম সম্পর্ক) তাঁর পর হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন (রা.) তাঁর প্রথম খলীফা হয়েছেন। তার বিয়েও লুধিয়ানায়, মরহুম হযরত মুন্সী আহমদ জান সাহেবের পরিবারে হয়েছে। (এটি দ্বিতীয় সম্পর্ক) আর এই ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে যে-ই ছেলের সম্পর্ক, তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সেই স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, যিনি লুধিয়ানাতে বসবাস করেছেন। [হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,] আমার মনে আছে, শৈশবে কিছুদিন আমি এখানেও থেকেছি।

তখন আমি এত ছোট ছিলাম যে, সে যুগের বিশেষ কোন কথা আমার স্মরণ নেই। কেননা, আমার বয়স তখন দুই বা আড়াই বছর ছিল। [এখন দেখুন! এই বয়সেও কিছু কথা তাঁর স্মৃতিতে অম্লান ছিল, যা সচরাচর স্মরণ থাকে না। কিন্তু তিনি সে কথাও বর্ণনা করছিলেন, তিনি (রা.) বলেন,] শুধু একটি ঘটনা আমার মনে আছে আর তা হল, আমরা যে বাড়িতে থাকতাম তা রাস্তার মাথায় ছিল, আর রাস্তা ছিল সোজা। আমি ঘর থেকে বাইরে যাই, তখন ছোট্ট একটি ছেলে অপর দিক থেকে আসছিল। সে আমার কাছে এসে একটি মৃত টিকটিকি আমার উপর ছুঁড়ে মারে। আমি এতটাই ভয়

পাই যে, কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরে আসি। সেই বাজারের চিত্রও আমার মনে আছে। এটি সোজা একটি বাজার ছিল। এখন আমি জানি না সেই বাজার কোন্‌টি ছিল। তখন আমাদের ঘর এক প্রান্তে ছিল। শৈশবের বেশ কয়েক মাস আমি এখানে কাটিয়েছি। কাজেই বিভিন্ন দিক থেকে আহমদীয়াতের সাথে এই শহরের সম্পর্ক রয়েছে। **(আহালিয়ানে লুধিয়ানা সে খিতাব, আনওয়ারুল উলুম, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ২৫৭-২৫৯)**

যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে, **হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই শহরের অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে**। তিনি (রা.) বলেন, আমি ভাবছিলাম, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যেসব কথা ঘোষণা করা হয়, সেসবের বিরোধিতা মানুষ অবশ্যই করে। আর মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর ঘোষণা করা হয়েছিল। লুধিয়ানার পূর্বেই লাহোরে জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে। হুশিয়ারপুরেও জলসা হয়েছে, কিন্তু বিরোধিতা হয় নি। জানি না, কেউ বিরোধিতা কেন করে নি। কিন্তু যখন লুধিয়ানা আসি, আর এখানে এসে আমি যখন শহর অতিক্রম করছিলাম, তখন মানুষের মিছিল এই জয়ধ্বনি দিতে দিতে অতিক্রম করছিল যে, নাঊযুবিল্লাহ্ মির্যা মারা গেছে, মির্যা মারা গেছে। যাহোক, এতে আমাদের কিছু যায় আসে না। তারা মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা ভুলে যাওয়ার কারণে এই হাসি-ঠাট্টা করে, কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীও অত্যন্ত মহিমার সাথে পূর্ণ হয়েছে। এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই দোয়াও করেন যে, খোদা তা'লা লুধিয়ানাবাসীদের হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার তৌফিক দিন, আর আজ যারা বিরোধিতায় ধ্বনি উচ্চকিত করছে আগামীকাল তারাই যেন তাঁর পক্ষে জয়ধ্বনি দেয়। **(আহালিয়ানে লুধিয়ানা সে খিতাব, আনওয়ারুল উলুম, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ২৬০)**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তাঁর (আ.) একজন সাহাবীর একনিষ্ঠ প্রেম এবং সম্পর্কের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেব (রা.)ও এরূপ গভীর ভালোবাসা রাখতেন। একবার তিনি কাদিয়ান আসেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে দিয়ে কোন কাজ করাচ্ছিলেন। মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেবের ছুটি যখন শেষ হয়ে যায় এবং তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চান, তখন হুযূর বলেন, আরো অপেক্ষা কর। তিনি ছুটির মেয়াদ বাড়ানোর জন্য আবেদন পত্র পাঠিয়ে দেন, কিন্তু তার অফিসের পক্ষ থেকে উত্তর আসে আর ছুটি দেয়া সম্ভব নয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে তিনি এর উল্লেখ করেন। তিনি (আ.) বলেন, আরো অপেক্ষা কর। তিনি লিখে পাঠিয়ে দেন, এখন আমি আসতে পারব না। তখন তার অফিসের কর্তারা তাকে বরখাস্ত করে (সরকারী মহকুমা ছিল)। চার বা ছয় মাস বা যতদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে সেখানে থাকতে বলেন, তিনি সেখানে অবস্থান করেন। এরপর যখন তিনি ফিরে আসেন, তখন তার অফিস এই প্রশ্নের অবতারণা করে যে, যেই কর্মকর্তা তাকে বরখাস্ত করেছে, সেই কর্মকর্তার তাকে বরখাস্ত করার কোন অধিকারই ছিল না। এভাবে তিনি নিজের জায়গায় পুনরায় বহাল হন, আর বিগত কয়েক মাস, যা তিনি কাদিয়ানে অতিবাহিত করেছেন, এর বেতনও পান।

একইভাবে, তিনি (রা.) আরো একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন, কপুরথলার মুন্সী জাফর আহমদ সাহেবের সাথে এই ঘটনা ঘটে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি ডালহৌসি সফর করছিলাম। রাস্তায় মিয়াঁ আতাউল্লাহ্ উকীল সাহেব আমাকে এই ঘটনা শুনিয়েছেন। এই ঘটনা ১৯৩৪ সনে আল্ হাকামেও ছেপেছে। [হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,] এজন্য আমি মুন্সী সাহেবের নিজের ভাষায় তা বর্ণনা করছি। তিনি বলেন, আমি যখন সেরেশতাদার নিযুক্ত হই, আর শুনানি বিভাগে কাজ করতাম তখন একবার মামলা-মোকদ্দমার কাজ ইত্যাদি বন্ধ করে কাদিয়ান চলে আসি।

তৃতীয় দিন যাওয়ার অনুমতি চাইলে [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,] অপেক্ষা করুন। এরপর তাঁকে অনুরোধ করা ঠিক মনে হল না। ভাবলাম, তিনি (আ.) নিজেই বলবেন। এক মাস পার হয়ে যায়। এদিকে মোকদ্দমার কাগজ-পত্র আমার বাসায় ছিল বিধায় কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে কঠোর ভাষায় পত্রাদি আসতে থাকে। কিন্তু এখানে যে পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল তা হল, এসব পত্র সম্পর্কে আমি ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করতাম না। (তিনি বলেন, আমি সব ভুলে যাই। পত্র আসলে আসুক) হুযূরের সাহচর্যে এমন এক আনন্দ এবং আত্মবিস্মৃতির মাঝে ছিলাম যে, চাকরি চলে যাওয়ার বা জবাবদিহিতার কোন পরওয়াই ছিল না। অবশেষে সেখান থেকে খুবই কঠিন একটি পত্র আসে। আমি সেই পত্র হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সামনে উপস্থাপন করি। তিনি (আ.) তা পড়ে বলেন, লিখে দাও, আমাদের আসা হবে না (আমরা এখন আসতে পারব না)। আমি এই বাক্যই লিখে পাঠাই।

এরপর আরো এক মাস কেটে যায়। একদিন তিনি (আ.) বলেন, কত দিন অতিবাহিত হয়েছে? তখন মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেই হিসেব করেন এবং বলেন, ঠিক আছে আপনি চলে যান। আমি কপুরথলা পৌঁছে মেজিস্ট্রেট লালা হার চান্দ দাসের বাসায় এটি জানার জন্য যাই যে, (সেই ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতেই তিনি চাকরি করতেন) কী সিদ্ধান্ত হয়েছে। (চাকরিতে বহাল রাখবেন, নাকি বের করে দিয়েছেন, নাকি জরিমানা করবেন, কি হয়েছে? যখন তার বাসায় গেলাম,) তখন তিনি বলেন, মুন্সী সাহেব! মির্যা সাহেব হয়তো আপনাকে আসতে দেন নি (এ কথাই মেজিস্ট্রেট বলেন)। আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলেন, তাঁর নির্দেশই শিরোধার্য [অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর]। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মিয়াঁ আতাউল্লাহ্ সাহেবের রেওয়ায়েতে অতিরিক্ত এই কথাটিও রয়েছে যে, মরহুম মুন্সী সাহেব বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন বলেন, লিখে পাঠিয়ে দাও, আমি আসতে পারব না, তখন আমি সেই বাক্যই লিখে ম্যাজিস্ট্রেটকে পাঠিয়ে দেই।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই একটি জামা'ত ছিল, যারা প্রেম ও ভালোবাসার এমন মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যে, এখন আমরা পূর্ববর্তী জামা'তসমূহের সামনে কোনভাবেই লজ্জিত হতে পারি না। আমাদের জামা'তের বন্ধুদের মাঝে যতই দুর্বলতা এবং ঔদাসীন্য থাকুক না কেন, যদি হযরত মূসা (আ.)-এর সাহাবীরা আমাদের সামনে নিজেদের আদর্শ তুলে ধরেন, তাহলে

আমরা তাদের সামনে এই জামা'তের আদর্শ তুলে ধরতে পারি। অনুরূপভাবে, হযরত ঈসা (আ.)-এর সাহাবীরা যদি কিয়ামত দিবসে নিজেদের মহান কার্যাবলী তুলে ধরে, তাহলে আমরা গর্বের সাথে তাদের সামনে আমাদের এসব সাহাবীকে উপস্থাপন করতে পারি। আর মহানবী (সা.) যে বলেছেন, আমি বলতে পারি না, আমার উম্মত এবং মাহ্দীর উম্মতের মাঝে কি পার্থক্য! কাজেই, সত্যিকার অর্থে এমন লোকদের কারণেই [তিনি (সা.) এ কথা] বলেছেন।

তাঁরা এমন মানুষ ছিলেন, যারা হযরত আবু বকর (রা.) এবং উমর (রা.) এবং উসমান (রা.) এবং আলী (রা.) ও অন্যান্য সাহাবা (রিযওয়ানুল্লাহ্ আলাইহিম)-এর ন্যায় সব ধরনের কুরবানী এবং ত্যাগ স্বীকার করতেন, আর আল্লাহ্র পথে সর্বপ্রকার বিপদাপদ সহ্য করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে দেখ! আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং যেহেতু তাঁকে জামা'তে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছেন, তাই আমি তাঁর নাম উল্লেখ করি নি। নতুবা তার কুরবানীর ঘটনাবলীও বিস্ময়কর।

তিনি যখন কাদিয়ান আসেন তখন ভেরায় তার প্র্যাকটিস বা অনুশীলন অব্যাহত ছিল, চিকিৎসালয় খুলেছিলেন, আর ব্যাপক পরিসরে কাজ চলছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে তিনি যখন বাড়ি যাওয়ার অনুমতি চান, তখন তিনি (আ.) বলেন, গিয়ে কি হবে, এখানেই থাকুন। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) সামগ্রী আনার জন্যও নিজে যান নি। (নিজ আসবাবপত্র আনার জন্যও যান নি) বরং অন্য কাউকে পাঠিয়ে ভেরা থেকে তাঁর জিনিস-পত্র আনিয়ে নেন। এসব কুরবানী এবং ত্যাগই বিভিন্ন জামা'তকে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়ে থাকে, আর এই মর্যাদা লাভের জন্যই প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত। নিছক দার্শনিকের মত ঈমান মানুষের কোন কাজে আসতে পারে না। সে ঈমানই মানুষের কাজে আসে, যাতে প্রেম এবং ভালোবাসার বৈশিষ্ট্য থাকে।

দার্শনিক নিজ ভালোবাসার যতই দাবি করুক না কেন, একমাত্র যুক্তি-তর্ক ছাড়া তার কোন গুরুত্বই নেই। কেননা, সে অন্তর-চক্ষুর মাধ্যমে সত্যকে দেখে নি, বরং শুধু যুক্তির নিরিখে দেখেছে। কিন্তু যে কেবল যুক্তির চোখে নয় বরং অন্তর-চক্ষুর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলী এবং সত্যকে চিনে, তাকে কেউ ধোঁকা দিতে পারে না। কেননা, মন-মস্তিষ্ক দর্শনের দাসত্ব করে আর হৃদয় প্রেমের অনুসরণ করে। **(আল্ ফযল, ২৮ আগষ্ট, ১৯৪১, পৃ. ৬-৭, ২৯তম খণ্ড, ১৯৬তম সংখ্যা)**

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে যুগ ইমামকে চেনার এবং এর উপর সব সময় প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দিন। সর্বদা আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলীকে চিনতে পারি, আর শয়তান যেন কখনো আমাদেরকে প্রতারিত করতে না পারে।

নামাযের পর এক ভাইয়ের গায়েবানা জানাযা পড়াব। এটি আমাদের এক দরবেশ ভাইয়ের জানাযা। তিনি হলেন, চৌধুরী নবাব দ্বীন সাহেবের পুত্র মৌলভী খুরশীদ আহমদ প্রভাকর সাহেব।

তিনি গত ২৮ জুলাই, ২০১৫ সনে ৯৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি লায়লপুরের (বর্তমানে এটি ফয়সালাবাদ নামে পরিচিত) একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মসূত্রে আহমদী ছিলেন। ১৯৩৬ সনে পনের বছর বয়সে প্রথমবার কাদিয়ান দর্শনে আসেন এবং মসজিদ মোবারকের ছাদে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর একটি প্রশ্নোত্তর অধিবেশনে যোগদান করেন। ফিরে যাওয়ার পুরো ভাড়া না থাকার কারণে কাদিয়ান থেকে অমৃতসর এবং সেখান থেকে লাহোর পর্যন্ত প্রায় ৯৫ কিলোমিটার দূরত্ব পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেন।

১৯ বছর বয়সে তিনি ওসীয়্যত করেন। ১৯৩৭ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর কাছে তিনি লিখেন, তাহরীকে জাদীদে অংশগ্রহণের মেয়াদ ডিসেম্বর ১৯৩৬-এ সমাপ্ত হয়েছে। আমি তখন ছাত্র ছিলাম। আমার এখন কিছু আয়-উপার্জন আছে। আমাকে ব্যতিক্রম হিসেবে তাহরীকে জাদীদে অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া হোক। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাকে এবং সকল আয়-উপার্জনহীন ছাত্র যাদের আয়-উপার্জন আরম্ভ হয়েছে মাত্র, তাদেরকে এই অনুমতি প্রদান করেন। এরপর মৌলভী খুরশীদ আহমদ প্রভাকর সাহেব সিন্ধুতে জামা'তের কৃষি জমিতেও কাজ করেছেন। ১৯৪৭ সনের প্রথম দিকে তিনি জীবন উৎসর্গ করে কাদিয়ান পৌঁছেন। সে বছরই ভারত বিভক্ত হয়, যার ফলে দরবেশীর সৌভাগ্য লাভ করেন। এই যুগকে তিনি একান্ত ধৈর্য, বিশ্বস্ততা এবং কৃতজ্ঞতার সাথে অতিবাহিত করেছেন। দেহাতী মুবাল্লিগ হিসেবে ভারতের উত্তর-প্রদেশে তবলীগ এবং প্রচারের কাজ সুন্দরভাবে সমাধা করেছেন।

তবলীগি ময়দান থেকে কাদিয়ান আসার পর তিনি তা'লীমুল ইসলাম হাই স্কুল ও কাদিয়ানের মাদ্রাসা-আহমদীয়ায় শিক্ষক হিসেবে সেবা প্রদানের সুযোগ পেয়েছেন। নাযারাত দাওয়াত ও তবলীগের অধীনে তিন বছর পর্যন্ত তিনি হিন্দী পড়েন এবং রতন, ভূষণ ও প্রভাকর, এই তিনটি হিন্দী ডিগ্রি অর্জন করেন। বেদ, বাইবেল, গীতা, গুরুগ্রন্থ সাহেব- এর উপর বেশ ভালো দখল ছিল। হিন্দু, শিখ ও খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে গবেষণামূলক রচনাবলী লিখেছেন। কুরআনের হিন্দী অনুবাদের সৌভাগ্যও তিনি লাভ করেছেন। দেশ বিভাগের পর ১৯৫২ সনে যখন পুনরায় বদর পত্রিকাটির প্রকাশনা আরম্ভ হয় তখন থেকেই এতে তার প্রবন্ধ ছাপতে শুরু করে। আর এই ধারা ২০১৩ সন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। অর্থাৎ তার প্রবন্ধ লেখার এই ধারা প্রায় ৬০ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এছাড়া জামা'তের অন্যান্য পত্র-পত্রিকা যেমন, মিশকাত, রাহে ঈমান ইত্যাদিতেও বিভিন্ন সময় তার প্রবন্ধ ছাপা হত। অন্যান্য দেশীয় পত্র-পত্রিকাও তার প্রবন্ধ ছেপেছে। দৈনিক হিন্দ সমাচার, মিলাপ এবং কাশ্মীরের পত্র-পত্রিকা এর অন্তর্ভুক্ত। ১৯৬৩ সনে নাযারাত দাওয়াত ও তবলীগের অধীনে 'বর্তমান সরকার এবং আহমদী মুসলমান' নামে তার একটি পুস্তিকা ছেপেছে এবং তা খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। তার বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং কবিতা খুবই উন্নত মানের হত।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)ও এর প্রশংসা করেছেন। আর পড়লেই বুঝা যেত, তা হৃদয় থেকে উদ্ভূত হচ্ছে। তিনি বড় জ্ঞানগর্ভ বিষয়বস্তু লিখতেন। কখনো কারো মুখাপেক্ষী হওয়া পছন্দ করেন নি। নিজের কাজ নিজেই করতেন। লেখাপড়ার কাজের পাশাপাশি ছেলেদেরকে সাথে নিয়ে কৃষিকাজও করতেন, গবাদি পশুও পালতেন। সম্পদশালী হয়ে সন্তানদের জন্য ব্যক্তিগত আবাসনের ব্যবস্থা করে জামা'তী ঘর আঞ্জুমানকে ফেরত দেন। এটি তিনি অনেক বড় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। চরম অসুস্থতার দিনগুলোতেও রীতিমত মসজিদে এসে নামায পড়তেন।

তিনি সত্য স্বপ্নও দেখতেন এবং খোলাফায়ে কেরামকে তা লিখে পাঠাতেন। মৃত্যুর এক মাস পূর্বে তার ছোট ছেলে ইব্রাহীমকে মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। এক সপ্তাহ পূর্বে তাকে আবার স্মরণও করিয়েছেন। তিনি দু'টি বিয়ে করেছিলেন। ১৯৪৪ সনে শ্রদ্ধেয়া আলম বিবির সাথে তার প্রথম বিয়ে হয়। সেই স্ত্রীর গর্ভে এক সন্তান রয়েছে, মুনীর আহমদ, যিনি পাকিস্তানে আছেন। আর দ্বিতীয় বিয়ে করেন ১৯৫৬ সনে কর্ণাটকের হাবলী নিবাসী আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের কন্যা আয়েশা বেগম সাহেবাকে, যার গর্ভে আল্লাহ্ তা'লা তাকে পাঁচজন পুত্র এবং তিনজন কন্যা সন্তান দান করেছেন।

তার ছেলেদের মাঝে ইসরাঈল আহমদ, কৃষণ আহমদ, ইব্রাহীম আহমদ এবং জামাতা শাকীল আহমদ ও মাহমুদ আহমদ সাহেব জামা'তের খিদমত করার তৌফিক পাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তান-সন্ততি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সর্বদা খিলাফত এবং জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত থাকার তৌফিক দিন। (আমীন)

(সূত্রঃ আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২১ আগষ্ট – ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৫, ২২তম খণ্ড, ৩৪-৩৫তম সংখ্যা, পৃ. ৫-৯)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।